বাংলাভাষার চর্চা নিয়ে কিছু অনধিকার চর্চা[1]

মৈত্রীশ ঘটক

> “লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয়না। ... যদি উভয় পক্ষ ইংরেজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়...আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।” বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

১

এই আক্ষেপটা অনেক সময়েই কানে আসে যে আজকালকার ছেলে মেয়েরা কেউ বাংলা পড়ছেনা, লিখছেনা । কোথা থেকে আসবে নতুন প্রজন্মের কালোত্তীর্ণ কবি-গদ্যকারেরা? আবার কবে জোয়ার আসবে, বিপুল কলরোলে নতুন নতুন দিশায় নিত্য জলোচ্ছ্বাসে বইবে, মোদের গরব মোদের আশা, বাংলা ভাষার দরিয়া ?

এখন তো সবাই ইংরেজি মিডিয়মে পড়ছে, ফটফট করে হিন্দি-ইংরেজি মেশান কিম্ভূত এক ভাষায় কথা বলছে, কুটকুট করে সাঙ্কেতিক ভাষায় টেক্সট পাঠাচ্ছে । বিস্ময়ে নয়, বিশ্বায়নে জাগছে সবার প্রাণ, মুক্ত বাজারের বিশ্বভরা মুক্তাঙ্গনে খেলতে নামার মহড়া নিচ্ছে সবাই। আজি হতে শতবর্ষ পরে কোনো অঘ্রাণের পথে পায়চারি করা শান্ত মানুষের হৃদয়ে স্মৃতির মিছিলেও কি উচ্চারিত হবে বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সব কবিতার পঙক্তি?

প্রাচীনপন্থীদের অতীতচারী বিলাপের প্রতি এমনিতে আমার খুব একটা সহানুভূতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত বক্তব্য আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগের, কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর সব প্রজন্মেরই মনে হয়, আমাদের সময়ে যা ছিল, এখন কিন্তু সেরকম আর নেই । অতীতচারীতা বাদ

[1] শারদীয় বারোমাস পত্রিকা, ২০১২।

দিলেও, যেকোনো বিষয় নিয়ে আলোচনাতেই উল্লাস-পন্থীদের থেকে বিলাপ-পন্থীদের গলাই যেন বেশি শোনা যায় । ভুলে গেলে চলবেনা জীবনানন্দ দাশ বা ঋত্বিক ঘটক তাঁদের জীবৎকালে কিংবদন্তী হননি । নিজেদের বাল্য-কৈশোর-যৌবন নিয়ে স্মৃতিমেদুরতার রোদমাখা কুয়াশায় অনেক সময়েই ঢাকা পড়ে যায় বাস্তব, অতীত হয়ে ওঠে মোহময়। মনে রাখতে হবে, ১৯৫০ সালে ভারতে গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর, ২০১০ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।[2]   তাই সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যাগুলি যে বড়ই মনোরম ছিল তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দীর্ঘতর আয়ুর কারণে সেগুলো নিয়ে স্মৃতিচারণের সুযোগও আজকাল আগের থেকে অনেক বেশি পাওয়া যায়।

এক নজর তথ্যের দিকে দেখলেও খটকা লাগতে বাধ্য । সারা পৃথিবীতে কুড়ি কোটির বেশি বাংলাভাষী মানুষ, এই রাজ্যে সাত কোটি স্বাক্ষর মানুষ, এবং প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক স্তরে বাংলা মাধ্যমে নথিভুক্ত। এই সংখ্যাগুলি সময়ের সাথে বেড়েছে, কমেনি। তবে আপাতদৃষ্টিতে অন্তত কলকাতা শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাংলা ভাষা চর্চা খানিকটা কমেছে বলে মনে হয় ।[3] একই সাথে আর্থিক উন্নয়ন এবং শিক্ষার বিস্তারের ফলে, শিক্ষিত শ্রেণীর প্রসার ঘটেছে, এবং শহুরে গণ্ডী থেকে বেরলে বাংলা পড়ছে এবং লিখছে এইরকম মানুষের সংখ্যা বেড়েছে । আর খেয়াল রাখতে হবে যে গত কয়েক দশকে এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বেড়েছে অনেকটাই । তাই আগেও যেমন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের ছেলেমেয়েরা গাড়ি করে ইংরেজি স্কুলে পড়তে যেত, এবং তারা মোটেই বাংলা বলতে চায়না বা বাংলা বই

[2] জাতীয় আয় বা আর্থিক উন্নয়নের অন্যান্য সূচকের ভালমন্দ বিচার নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু গড় আয়ু বৃদ্ধি হওয়া যে ভাল কথা আশা করি হয়ত ভুতেরা ছাড়া বাকি সবাই একমত হতে পারবেন।

[3] নিজের জ্ঞান ও পরিচিতির সীমাবদ্ধতার কারণে এই আলোচনা মূলত পশ্চিমবঙ্গ-কেন্দ্রিক । মানতেই হবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার যেকোনো আলোচনা বাংলাদেশকে বাদ দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় ।

পড়েনা বলে তাদের মা-বাবারা হয় গর্ব নয়তো দুঃখ করত, আজও তাই আছে। শুধু উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছেন যাঁরা, তাঁরা বড় হয়েছেন মধ্যবিত্ত হিসেবে, তাই তাঁদের অনেকের চোখে এই পরিবর্তন বিসদৃশ লাগছে এবং তাই থেকে তাঁরা সারা সমাজেই এই রকম হচ্ছে ধরে নিচ্ছেন । প্রশ্ন হল, আজও যারা মধ্যবিত্ত আছেন, বা নিম্নবিত্ত থেকে আর্থিক উন্নতির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন, আগেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় তাঁদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা বেড়েছে না কমেছে ।

অর্থাৎ, দুটো কথা মনে রাখতে হবে । প্রথমত, সামাজিক-বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন পর্যবেক্ষকের পক্ষপাত (observer's bias) I আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তা থেকে বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে চট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ নয় কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যারা আমাদের মত তাদের সাথেই বেশি মেলামেশা করি সমাজের সব শ্রেণীর সাথে সমান ভাবে মিশিনা । সে বিষয়ে আমরা সবসময়ে সচেতন থাকিনা ।

দ্বিতীয়ত, তুলনা করতে হলে সমানে সমানে করতে হবে - আগে যে শ্রেণীর মধ্যে বাংলা চর্চা বেশি হত, সেই শ্রেণীর মধ্যে বাংলা চর্চা বেড়েছে না কমেছে দেখতে হবে । অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে ওঠানামা (mobility) বাড়ে, তাই আগে যারা সেই শ্রেণীতে ছিলেন এখন তাঁরা বা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারেন ।

সত্যি কি বাংলা ভাষার চর্চা কমছে? বলে রাখা ভাল এই প্রশ্নের সদুত্তর দেবার মত বিস্তারিত তথ্য বা গভীর জ্ঞান কোনটাই আমার নেই। পেশায় অর্থনীতির গবেষক হবার কারণে যে কোন বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ও মতামতের পিছল রাস্তা শুকনো কাঠখোট্টা তথ্যের লাঠি ধরে কতটা এগোনো যায় সেটা ভাবা অভ্যাস । আর বাংলা ভাষার প্রতি আশৈশব প্রবল অনুরাগের কারণে, যাঁদের "গেল গেল" বিলাপ দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, ইদানিং অনেকসময় চমকে উঠছি নিজেরই

গলায় তাদের সুর শুনে । তাই অনধিকার চর্চা হলেও খানিকটা নিজেকে ভারমুক্ত করার তাগিদেই এই বিষয়ে কিছু তথ্য ও চিন্তাভাবনা বিদগ্ধ পাঠকের কাছে পেশ করলাম।

২

তথ্যের দিকে এক নজর তাকালে মনে হবে বিলাপপন্থীদের আশংকা অমূলক নয়। একটি প্রামাণ্য সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে ২০১০ সালে সারা ভারতে প্রাথমিক স্তরের (ক্লাস ১-৮) ছাত্রছাত্রী যারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনো করছে বলে নথিভুক্ত (enrolled) তাদের সংখ্যা হল দুই কোটি চার লক্ষ । [4] ২০০৩-০৪ তুলনায় তার বৃদ্ধির হার হল ২৭৪%, অর্থাৎ আগের থেকে বেড়ে প্রায় চারগুণ হয়েছে! ২০০৬ সালেও প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সারা ভারতে ইংরেজির স্থান ছিল চতুর্থ, হিন্দী, বাংলা ও মারাঠির পরে। এখন তা হিন্দীর পরেই দ্বিতীয় স্থান নিয়েছে । হিন্দী সম্পর্কে এই দুটি বছরের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়না, কিন্তু ২০০৩ আর ২০০৮ এর তুলনা করলে দেখছি প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির বৃদ্ধির হার ১৫০% (অর্থাৎ আড়াইগুণ বেড়েছে) আর হিন্দীর হল ৩২%।

রাজ্য-পর্যায়ে তথ্য দেখলে ছবিটা অন্তত পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অতটা অন্ধকার নয় ।[5] পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ২০০৬ এবং ২০১০-এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরে বাংলা মাধ্যমে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১৬% কিন্তু ইংরেজি তে বেড়েছে ৬০% । [6] অর্থাৎ জাতীয় স্তরের তুলনায় নাটকীয় না

---

[4] প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সরকারি সংস্থা National University of Educational Planning and Administration (NUEPA) প্রকাশিত নানা রিপোর্ট এবং "প্রথম" নামক এনজিও দ্বারা প্রকাশিত Annual Survey of Education Report (ASER) থেকে সঙ্কলিত । এই রিপোর্ট গুলি ইন্টারনেটেই পাওয়া যায় । উৎসাহী পাঠক www.dise.in এবং http://www.pratham.org/M-19-3-ASER.aspx এই দুটি ওয়েবসাইট দেখতে পারেন ।

[5] রাজ্যেগুলির তথ্য বিশ্লেষণে সেই রাজ্যের প্রধান আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজির মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব ।

[6] সূত্র : NUEPA. ২০১০ সালে প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে মোট নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১.৩৭ কোটি, আর ২.৮০ লক্ষ ।

হলেও, এ রাজ্যেও ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার বিস্তার দ্রুত হারে বাড়ছে। আর এই সমীক্ষা গুলিতে যেহেতু বেসরকারি সরকারি-অনুদান নির্ভর নয় এমন বিদ্যালয়গুলি (যেখানে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ে) অনেক সময়েই অংশগ্রহণ করেনা, তাই এই সংখ্যা গুলিকে আসল সংখ্যার নিম্নতর সীমা ভাবাই ভাল । তুলনায় একই সময়ে অন্যান্য রাজ্যে মূল আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার শুধু নগন্যই নয়, বেশ কিছু রাজ্যে তা বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে ।[7] এই রাজ্যগুলিতে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গের থেকে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বেশি (যা জাতীয় গড় থেকেও অনুমান করা যায়)।

এখন পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে প্রাথমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৭%, তাই কেউ বলতে পারেন এই ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে ছিল, তাই উন্নতির অবকাশ ছিল । কিন্তু তথ্য এই মতকে সমর্থন করেনা । ২০০৫ সালে সারা ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত বয়সে যথাক্রমে ৬.৬% এবং ৪.৪% শতাংশ বালক-বালিকা স্কুলে নথিভুক্ত ছিলনা (হয় তারা স্কুলে ভর্তিই হয়নি, নয়তো স্কুলে পড়া ছেড়ে দিয়েছে)। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সংখ্যাবৃদ্ধিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নয়ন অনেক কারণ থাকতে পারে ।

মেনে নিতেই হবে স্কুলে নথিভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। তাহলেও, পূর্বোল্লিখিত একটি সমীক্ষার (ASER) কিছু তথ্য এখানে প্রাসঙ্গিক । "প্রথম" বলে যে এনজিও-টি এই সমীক্ষাটি করে তারা সারা ভারতে সব জেলায় প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে পারে কিনা বা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে পারে কিনা তা নিয়ে

[7] যেমন, তেলুগু, তামিল, ও মালয়ালামে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাসের হার যথাক্রমে ২০%,১৬%, ও ১৫%, আর গুজরাটি ও মারাঠিতে প্রায় কোন পরিবর্তন নেই । দিল্লীতে হিন্দী মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাসের হার ৬%, আর ইংরেজির বৃদ্ধির হার ৩২%।

নিজেরা সর্বভারতীয় একটি পরীক্ষা নেয় (অবশ্যই স্থানীয় ভাষায়) যার সাথে সেই বিদ্যালয়ের বা সরকারি কোন সংস্থার কোন সম্পর্ক নেই। তার ফল থেকে জানা যাচ্ছে যে সারা ভারতের গড়ের থেকে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে আছে যদিও সার্বিক ভাবে যে ছবিটা ফুটে ওঠে তা অবশ্য খুব উজ্জ্বল নয়, দেশের বা রাজ্যের পক্ষে।[8]

এই আলোচনা থেকে প্রাথমিক যে ছবিটা ফুটে উঠছে তা হল, ইংরেজি যে স্থানীয় ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সরিয়ে দিচ্ছে এটা সারা দেশব্যাপী একটা প্রবণতা। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলার বৃদ্ধি নগন্য নয়, বিশেষত অন্য রাজ্যের তুলনায়। ২০১০ সালে, বিগত কয়েক বছরে ইংরেজির দ্রুত বিস্তার সত্তেও, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ আশি হাজার আর বাংলা মাধ্যম স্কুলে ছিল প্রায় এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশগুন বেশি। অন্যান্য রাজ্যে এই ব্যবধান অনেক কম। শুধু তাই নয় অন্য একটি দেশব্যাপী সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে সারা ভারতে ৭৫% প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষা এবং স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম এক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা হল ৯২%![9] অর্থাৎ, সর্বত্র ইংরেজির রমরমা নিয়ে কোন সন্দেহর অবকাশ নেই, কিন্তু কলকাতার মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বাইরে বেরিয়ে সারা রাজ্যের দিকে তাকালে মনে হয় বাংলা ভাষার বিলুপ্তপ্রায় হবার খবরটা হয়তো বা একটু অতিরঞ্জিত।

৩

[8] যেমন, সারা ভারতে যারা ক্লাস ৩ থেকে ৮-এ পড়ে সেই ছাত্রছাত্রীদের ৫৮% ক্লাস ১-এর উপযুক্ত পাঠ্যবই বা তার বেশি পড়তে পারে, আর ৪৬% বিয়োগ বা তার বেশি অঙ্ক করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলি হল যথাক্রমে ৬১% ও ৫৪%।

[9] সূত্র : ASER.

কেন আগের থেকে বেশি লোকে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াচ্ছে তার উত্তর খুব সোজা। আর্থিক উদারীকরণ, বিশ্বায়ন, এবং তথ্য-প্রযুক্তি ও দূরসংযোগের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে চাকরির বাজারে শিক্ষার এবং ইংরেজি জানার দাম আগের থেকে অনেক বেশি বেড়েছে । প্রশ্ন হল, কতটা বেশি? নানা গবেষণাপত্র থেকে এই তথ্যগুলো জানা যাচ্ছে - ইংরেজি জানলে প্রতি ঘণ্টার মজুরি গড়ে বাড়ে ২২-৩৪% আর তার সাথে বিএ পাশ হলে, বৃদ্ধির মান হল ৪০-৫৫% ; ইংরেজি জানার জন্যে চাকরির বাজারে যে আর্থিক সুবিধা, তা ১৯৮০-র তুলনায় ১৯৯০ এর দশকে এবং ২০০০-এর দশকের গোড়ায় অনেকটা বাড়ে, এবং এই বৃদ্ধি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যাচ্ছে । [10]

তাহলে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ইংরেজি-মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার সীমিত কেন? তার একটা বড় কারণ হল এখানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার তুলনায় কম, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি বা দূরসংযোগের ক্ষেত্রে । তুলনামুলক ভাবে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে অনায়াসে পাল্লা দিতে সক্ষম ও সফল । অন্যদের ক্ষেত্রে ইংরেজি-মাধ্যমে শিক্ষার এবং উচ্চশিক্ষার জন্য যে আর্থিক বিনিয়োগের প্রয়োজন তার ক্ষমতা কম । অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির ফলে তাই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য বেড়েছে, যদিও তথ্যপ্রযুক্তি বা দূরসংযোগের অভাবনীয় উন্নতির প্রত্যক্ষ কিছু সুফল সব শ্রেণীর মানুষই পেয়েছেন, যথা মোবাইল ফোন ।

আরেকটি কারণ হল বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি । ১৯৮৩ সালে প্রাথমিক সরকারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত ইংরেজি তুলে দেওয়ার নীতিগ্রহণ করা হয় । তারপর দীর্ঘকাল নানা যুক্তি-তর্ক-আলোচনার পর ২০০৪-০৫ থেকে এই নীতি

---

[10] সূত্র : Mehtabul Azam, Aimee Chin, and Nishith Prakash (2010) “The Returns to English-Language Skills in India”, Working Paper, University of Houston; Kaivan Munshi and Mark Rosenzweig (2006): “Traditional Institutions Meet the Modern World: Caste, Gender, and Schooling Choice in a Globalizing Economy,” *American Economic Review*.

তুলে নেওয়া হয়। অন্য কিছু রাজ্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গের তুলনার ভিত্তিতে এই নীতির ফলাফল নিয়ে সম্প্রতি দুটি গবেষণাপত্র হাতে এসেছে ।[11] জানা যাচ্ছে যে, এই নীতির দ্বারা যে প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা প্রভাবিত তাদের তুলনায় যারা এই নীতির আওতায় পড়েনি, তাদের মাইনে গড়ে ৩০% বেশি এবং এর মূল কারণ হল আপেক্ষিকভাবে উচ্চমানের চাকরির সুযোগ পাওয়া । শুধু তাই না, এই নীতির ফলে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বা স্কুলে যাবার হার সামগ্রিকভাবে বাড়েনি। বরং বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে গৃহশিক্ষকতার প্রসার । যেহেতু এই সুযোগ গুলি যারা স্বচ্ছল তাদের বেশি, এর ফলে অসাম্য বেড়েছে, কমেনি ।

এই নীতির ফলে কলকাতা শহরে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকটা কমে যায় । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই ছেলেমেয়েদের বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করে দেন, এবং এর ফলে অনেক বাংলা-মাধ্যম স্কুল উঠে যায়। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা সমান গুরুত্ব বা মর্যাদা পায়নি, যার ফলে সময়ের সাথে বাংলা ভাষা শিক্ষার সামগ্রিক মানের অবনতি হয় ।[12] শুধু তাই নয়, এই নীতির ফলে বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির বাজারের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে । এর ফলে শুধু আর্থিক বৈষম্যই বাড়েনি সামাজিক বৈষম্যও বেড়েছে ।

ইংরেজি ভাষা চিরকালই অভিজাত শ্রেণীর ভাষা কিন্তু বাংলা মাধ্যম স্কুল গুলিতে ইংরেজি শিক্ষার মান অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চ হবার কারণে তারা মধ্যবিত্তের সামাজিক উত্থানের সহায়ক ছিল । সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভাবে আলাদা পরিবেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা একসাথে মেলামেশা করাও সামাজিক বৈষম্য

---

[11] সুত্র : Joydeep Roy (2004): "Redistributing Educational Attainment: Evidence from an Unusual Policy Experiment in India", Working Paper, Princeton University; Tanika Chakraborty and Shilpi Kapur Bakshi (2012): "English Language Premium: Evidence From A Policy Experiment In India," Working Paper, IIT Kanpur.

[12] সুত্র : Anasuya Basu, "Bengali to English", The Telegraph (October 24, 2010).

কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেও বাংলাশিক্ষার মান বেশ উঁচু ছিল । এই সব কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি বাংলা এবং ইংরেজি দুয়েই পারঙ্গম ছিল। মনে রাখতে হবে বাংলাভাষার অনেক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ইংরেজি নিয়ে পড়াশুনো এবং অধ্যাপনা করেন, যেমন জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, লীলা মজুমদার, ও মহাশ্বেতা দেবী।

যেহেতু নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে অর্থনৈতিক উদারীকরণের ফলে সারা দেশে চাকরির বাজারে ইংরেজি শিক্ষার মুল্য নাটকীয় ভাবে বেড়ে যায়, রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে দেখলে এই নীতি অবলম্বন করার সময়টা এর থেকে খারাপ হতে পারতনা। শুধু তাইনা, এই নীতির ফলে অসাম্য বেড়েছে বই কমে নি, সামাজিক উত্থানের সুযোগও সঙ্কুচিত হয়েছে ।

সাম্প্রতিককালে আমরা সারা রাজ্যে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের যে পরিসংখ্যান দেখেছি (বিশেষ করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের তুলনায়), তার পেছনে এই নীতির কিছুটা সদর্থক ভূমিকা থাকতে পারে। কিন্তু বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়ানর পেছনে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছের চেয়ে বাধ্যবাধকতার ভূমিকা বেশি বলে মনে হয় (ইংরেজি শিখলে গড় আয়ের তফাৎ যেখানে ৩০%) তাই এ ক্ষেত্রেও সান্ত্বনার খুব একটা অবকাশ দেখছিনা।

৪

ছাত্রছাত্রীদের ছেড়ে এবার বড়দের কথায় আসি। ১৯৮১ সালে রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার ছিল ৪৮%, তা বেড়ে ২০১১ সালে হয়েছে ৭৭%, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার হল ৬০% ।[13] অর্থাৎ, সারা রাজ্যে প্রায় সাত কোটি স্বাক্ষর মানুষ যাঁদের অধিকাংশই বাঙালি। স্বাক্ষর মানেই পাঠ করতে সক্ষম নয়। তাই এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচারের পরিসংখ্যান যদি

[13] একই সময়ে সারা দেশে স্বাক্ষরতার হার ৪৩% থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৪%। সব সময়েই জাতীয় গড়ের থেকে পশ্চিমবঙ্গ খানিকটা এগিয়ে থেকেছে।

দেখি তাহলে দেখব তার গড় দৈনিক বিক্রী ১৯৮২ সালে ৪ লক্ষ ৮ হাজার থেকে তিন গুণ (অর্থাৎ, ২০০%) বেড়ে ২০১১ সালে হয়েছে ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার। তার মানে একই সময়ে বাংলা সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা রাজ্যে স্বাক্ষরতার হারের (এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের) থেকে অনেক দ্রুতবেগে বেড়েছে।[14] তাই অনুমান করা যায় বাংলা পড়তে সক্ষম মানুষের সংখ্যা গত তিরিশ বছরে বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই বেড়েছে।

এই সময়ে ইংরেজি সংবাদপত্রের বৃদ্ধির হার কি? তা যদি আরও অনেক বেশি হারে বেড়ে থাকে তাহলে ইংরেজির তুলনায় বাংলা ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেছে মেনে নিতে হবে। পরিসংখ্যান বলছে ১৯৯০ ও ২০১০ সালের মধ্যে রাজ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি কাগজ দ্য টেলিগ্রাফের গড় দৈনিক বিক্রী ১ লক্ষ ২৯ হাজার থেকে বেড়ে হয় ৪ লক্ষ ৮১ হাজার।[15] একই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার বিক্রী বেড়ে হয় ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার থেকে ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার। প্রথম ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার প্রায় ২৭৩% আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ২০১%। তবু ২০১০ সালেও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার দ্য টেলিগ্রাফের প্রায় আড়াই গুণ (১৯৯০ সালে ছিল তিন গুণ)। অর্থাৎ ইংরেজি সংবাদপত্রের বিক্রি বাংলার থেকে খানিকটা বেশি হারে বাড়লেও, প্রাথমিক শিক্ষার ভাষার মাধ্যমের তুলনামূলক বৃদ্ধির মতোই, এই নিরিখেও বাংলা ভাষা খুব পিছিয়ে পড়েছে বা পড়ছে, তা মনে হচ্ছেনা।

এটা ঠিকই যে একই গোষ্ঠীর দুটি কাগজের প্রচারের পরিসংখ্যান থেকে সারা রাজ্যের যে ছবি পাওয়া যায় তা আংশিক হতে বাধ্য।[16] কিন্তু অন্যান্য সূত্র থেকে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে একই রকম ছবি ফুটে উঠছে। যেমন, ২০০১ আর ২০০৮ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও পত্রিকার

---

[14]এই সময়ে রাজ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে ৫৪৫ লক্ষ থেকে ৯১৩ লক্ষ, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার হল ৬৭%।

[15] দ্য টেলিগ্রাফ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে, তাই ১৯৯০ সাল থেকে তুলনা করেছি।

[16] তা ছাড়া একই সাথে এই দুটি কাগজের গ্রাহক হলে আর্থিক ছাড় পাওয়া যায় তাই এদের বৃদ্ধির হার স্বাধীন নয়।

মোট সংখ্যা ২৭৪১ থেকে বেড়ে হয় ৩২৪৪ (বৃদ্ধির হার ১৮%)। একই সময়ে সারা দেশে ইংরেজি সংবাদপত্র ও পত্রিকার সংখ্যা ৭৫৯৬ থেকে বেড়ে হয় ১০০০০ (বৃদ্ধির হার ৩১%) আর হিন্দীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ২০৫৮৯ থেকে বেড়ে হয় ২৭৫২৭ (বৃদ্ধির হার ৩৩%)। [17]

তাই দেখা যাচ্ছে, বাংলা ইংরেজি দুই ভাষাতেই সংবাদপত্রের প্রচার ও সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলা ভাষার সংবাদপত্রের গুরুত্ব বা প্রসার কমেনি। বাংলা বই-এর বিক্রী, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলির মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণ নিয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান যোগাড় করে উঠতে পারিনি। হাতের কাছে যা পেয়েছি তা হল বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু পরিসংখ্যান।

দেখা যাচ্ছে ২০০৬ সালে সেন্সর বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত বাংলা চলচ্চিত্রের সংখ্যা ছিল ৪২, যা থেকে বেড়ে ২০১১ সালে তা হয় ১২২। একই সময় সেন্সর বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত হিন্দী ছবির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২৩ ও ২০৬। [18] তাই হিন্দী ছবির অনুপাতে হিসেব করলে বাংলা ছবির আপেক্ষিক গুরুত্ব এই সময়ের মধ্যে ১৮% থেকে বেড়ে ৬০% হয়েছে। এই সময়ে বাৎসরিক পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে যে হিন্দী ছবির সংখ্যা খুব একটা বাড়ে কমেনি (২০৬-২৫৮), কিন্তু বাংলা ছবির সংখ্যা বেড়েছে চমকপ্রদ হারে। শুধু তাই না, আরও বড় সময়সীমার মধ্যে পরিসংখ্যান দেখলেও ছবিটা পাল্টায়না। ১৯৫০ সাল থেকে যে সীমিত পরিসংখ্যান আমার কাছে আছে তা থেকে দেখছি যে পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে হিন্দী ছবির অনুপাতে বাংলা ছবির সংখ্যা ২০১০ সালের আগে কখনো ৫০% ছাড়ায়নি, ১৫% থেকে ৪২% এই সীমার মধ্যে ওঠা পড়া করেছে। টেলিভিশনের চ্যানেলের সংখ্যাও গত দশ বছরে ৪-৫ থেকে প্রায় দশগুণ বেড়েছে।

---

[17] সুত্র : Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting.

[18] সূত্র Central Board of Film Certification-এর বিভিন্ন সাম্প্রতিক প্রকাশনা। ১৯৯৫ সালের আগের পরিসংখ্যান Encyclopedia of Indian Cinema, ed. Ashish Rajadhyaksha & Paul Willemen, BFI/Oxford University Press, 1999 থেকে নেওয়া, মূল সূত্র যদিও এক। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৯৫-২০০৫ সালের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পারিনি।

এটা ঠিক, সংখ্যার সাথে উৎকর্ষের সম্পর্ক নাই থাকতে পারে । এও ধরে নেওয়া যায়না যে বাংলা ছবির এই আপাত-ঊর্ধ্বমুখী ধারা চিরকালই থাকবে । এই প্রবণতার বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করাও আমার উদ্দেশ্য নয় । আমার উদ্দেশ্য হল একটা খটকা পাঠকের কাছে পেশ করা । বাংলাভাষার চর্চা যদি সত্যিই উঠে যেতে বসেছে, তাহলে এই ছবি গুলো তৈরি হচ্ছে কেন ? বলতেই পারেন এই সব ছবির অধিকাংশই হয় লারেলাপ্পা-মার্কা নয়তো অশ্রুসিক্ত সাংসারিক নাটক গোছের “ব্যবসায়িক” ছবি যা থেকে শিক্ষিত দর্শকেরা মুখ ফিরিয়ে থাকেন । আমজনতা কে নয় বাদই দিলাম । গত কয়েক বছরে কিন্তু বহু বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে যা শিল্পের বিচারে উচ্চ থেকে মধ্য-মানের আবার বাণিজ্যিক ভাবেও সফল । এর মধ্যে অবশ্যই “ভুতের ভবিষ্যৎ”-এর মত ভুতুড়ে রকমের ভাল ছবিও আছে যার মজাদার গান ও সংলাপ এখন সবার মুখে মুখে । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি যদি বাংলাবিমুখ হয়, তাহলে সেটা সম্ভব হল কি করে?

শুধু তাই না, আশপাশে তাকালে বাংলা সংস্কৃতির কিছু আপাত-নতুন ধারার জোয়ার চোখে পড়ে । বাচিক শিল্প (আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক), জীবনমুখী গান, বা বাংলা ব্যান্ড কোনটাই খুব সাম্প্রতিক উদ্ভাবন নয় । তবে আমাদের প্রতিদিনের ভাষায় এই শব্দগুলি ঢুকে পড়েছে খুব বেশিদিন হয়নি, যা সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য ভাবে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিরই লক্ষণ বলেই মনে হয় । বাংলা নাটক ও গানের ক্ষেত্রেও নিত্যনতুন নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে এবং অনেকক্ষেত্রেই তা জনপ্রিয়তার প্রসাদ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে না। বাংলা সংস্কৃতি জগতের সামগ্রিক ছবি আঁকা আমার উদ্দেশ্য নয় । কিন্তু আংশিক যে ছবিটা ফুটে উঠছে তা আমার কাছে অন্তত সম্পূর্ণ-ভাবে নিরাশাজনক মনে হচ্ছে না ।

৫

আমাদের শিক্ষিত মধ্য ও উচ্চবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে একটা আশ্চর্য আত্মমগ্নতা আছে । গ্রামের বা কলকাতারই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের খুব বেশি খেয়াল থাকেনা, কাজের লোকের যোগান নিয়ে বিলাপ করা ছাড়া । তাই বাঙালি নন এমন কেউ শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে এই রাজ্যে সাত কোটি স্বাক্ষর মানুষ, প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক স্তরে বাংলা মাধ্যমে নথিভুক্ত, আনন্দবাজার পত্রিকাসহ প্রথম পাঁচটি বাংলা সংবাদপত্রের দৈনিক পাঠক সংখ্যা এক কোটির বেশি, বাংলা ছবি-সিরিয়ালের রমরমা বাজার, অথচ বাংলা ভাষার চর্চা নাকি উঠে যেতে বসেছে![19] আসলে বরং বাংলাভাষা চর্চার ভারকেন্দ্র খানিকটা কলকাতার থেকে গ্রামবাংলা ও মফঃস্বলের দিকে সরেছে বলে মনে হয়।[20] তাই বাংলা ভাষাচর্চার সঙ্কট যদি বাস্তবও হয় তা সর্বজনীন না শহুরে শিক্ষিত এলিটদের (বা তাঁদের ছেলেমেয়েদের) সে ব্যাপারে পরিষ্কার থাকা উচিৎ।

তার মানে এই নয় যে কোন সমস্যা নেই। চারপাশ দেখলে মধ্য ও উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারে বাংলা ভাষার চর্চা খানিকটা কমেছে বলে মনে হয় যদিও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন তথ্য আমার হাতে নেই, আর পূর্বোল্লিখিত পর্যবেক্ষকের পক্ষপাতের সন্দেহটা থেকেই যায় । আর হয়ত যেটা খানিক কমেছে তা হল উচ্চমার্গের বাংলা ভাষার চর্চা, যার ভাল একটা উদাহরণ হল প্রবন্ধসাহিত্য। বাংলা পড়তে পারা, বলতে পারা, বা জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম হবার থেকে এটা আলাদা একটা বিষয়।

---

[19] সংবাদপত্রের প্রচারের সংখ্যাকে পাঠক পরিবেরের গড় সদস্যসংখ্যা দিয়ে গুণ করে পাঠকের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

[20] বাংলা বই-এর বিক্রী অথবা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের পরিসংখ্যান দেখলে এই প্রবণতা খানিকটা ধরা পড়বে বলে আমার ধারণা।

ইংরেজি শুধু অর্থোপার্জনের ভাষা নয়, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, এবং সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে যোগসাধনের একমাত্র সোপান। প্রায় একশ বছর আগে লেখা একটি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী ইংরেজি ভাষাকে বাঙালির দ্বি-মাতৃভাষা আখ্যা দেন, শিক্ষিত বাঙালির ক্ষেত্রে আজও তা সুপ্রযুক্ত এবং এতে আপত্তির কিছু নেই।[21] ইংরেজি কে বাদ দিয়ে বাংলার প্রসার বা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই গ্রামবাংলায় ইংরেজির প্রসার এবং শহরে বাংলার প্রসার এই দুইই কাম্য।

তবে এই প্রক্রিয়াকে একটা বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় দেখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির হাল যদি করুণ না হত, ব্যবসার তাগিদে বাইরের লোককে বাংলা শিখতে হত। তাতে বাংলাভাষার চর্চা আপনি বাড়ত। কল সেন্টারে নদীয়ার নন্দন এখন নর্মান নাম নিয়ে মার্কিনী উচ্চারণে তালিম নেয় সেই দেশের ক্রেতার সেবায় নিযুক্ত হতে, তখন তার উলটোটা হত। বাংলাভাষার চর্চার দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্প নেই। তবে ভাষার ব্যবহার শুধু পেশার বা বাণিজ্যের জগতে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও বিনোদনের জগতে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক থেকে দেখলে বাংলাচর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি অতটা চিন্তিত নই।

তাহলেও বাংলাভাষার চর্চা বাড়ানোর জন্যে আমাদের কিছু কি করার আছে? আইন-কানুন বা জননিরাপত্তার বিষয় বাদ দিলে অধিকাংশ সরকারির নীতির ক্ষেত্রেই নাগরিকদের কাছে বিকল্পের সংখ্যা কমানোর থেকে বাড়ানোই শ্রেয় মনে করা হয়। প্রাথমিক স্তরে বাংলা তুলে দেবার নীতির ব্যর্থতাও এটাকেই প্রমাণ করে। সমাজ, রাজনীতি, বা ধর্মের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি করে "এটা করা যাবেনা" বা "এটা করতে হবে" ধরণের চাপিয়ে দেওয়া নীতিকে আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী বলে মনে করি। তাই বাংলাভাষা চর্চার প্রসারের প্রয়াসে এই ধরণের কোন প্রস্তাব শুনলে তা বিপথগামী বলে আশংকা হয়। কি ভাবে

[21] "বাংলার ভবিষ্যৎ", ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করা যায়, বরং সেটা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন ।